



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 392 - 400

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

বাদল সরকারের ‘বাকি ইতিহাস’ : মধ্যবিত্ত জীবন ভাবনার শৈল্পিক রূপায়ণ

তাসফিয়া তাসমিন মিশু

প্রভাষক, বাংলা বিভাগ

বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউবিটি)

মিরপুর-২, ঢাকা, বাংলাদেশ

Email ID: tasfiamishu332@gmail.com

 0009-0003-8993-6226

Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Badal Sarkar,
Baki Itihas,
Middle-Class Life,
Psychological
Disorder,
Absurdity,
Dramatic Style,
Artistic Value.

Abstract

Badal Sarkar's play *Baki Itihas* (1965) is a unique document of the crisis and existential anguish of the middle-class psyche. The play revolves around the conflict between the external normality and internal disorder of middle-class life. In this play, the playwright has exposed the sexual desires, moral lapses, family crises and the conventional beauty of society hidden behind the daily lives of Sharadindu and his wife Basanti. The main objective of the present research article is to reveal a special aspect of the complex stratification and artistic embodiment of the middle-class mentality in this play. The study adopts a qualitative and analytical approach based on close textual reading of the play. It examines how Badal Sarkar employs symbolism, psychological realism, and existential philosophy to portray the fragmented consciousness of the modern middle class. The characters are not merely individuals but symbolic representations of a social class struggling with alienation, insecurity, and emotional isolation. Through the conflicts experienced by Sharadindu and Basanti, the playwright reveals the hidden tensions between personal aspirations and social obligations. The play also reflects the impact of urbanization, changing moral values, and the growing sense of identity crisis among educated middle-class people in post-independence India. Sarkar's innovative dramatic technique, non-linear narrative structure, and symbolic characterization intensify the emotional and philosophical depth of the play. Furthermore, *Baki Itihas* questions conventional social norms and challenges the audience to confront the realities concealed beneath respectable middle-class life. The study argues that the play remains relevant in contemporary society because the psychological conflicts, existential anxieties, and social contradictions it portrays continue to shape modern human existence.

Discussion

বাংলা তথা ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের অন্যতম কিংবদন্তি, থার্ড থিয়েটারের সাড়া জাগানো নাট্যকার বাদল সরকার (১৯২৬-২০১১)। ষাটের দশকের কৌতুক নাটক ও অ্যাবসার্ড নাটক রচনার পর্ব পেরিয়ে আসে সত্তর দশক। আর এ দশকে ‘থার্ড

থিয়েটার’ নামক ভিন্ন এক নাট্য আঙ্গিক নিয়ে আসেন বাদল সরকার। তাঁর অন্যতম আলোচিত নাটক ‘বাকি ইতিহাস’ (১৯৯৬)। এ নাটকটিতে নাট্যকার বাদল সরকার তুলে এনেছেন মধ্যবিত্ত জীবনের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক নানা সম্পর্কের সংকট, আত্মবিচ্ছেদ, বিকার, বিবেকের দংশন, মর্মযন্ত্রণা ইত্যাদি। পশ্চিমবঙ্গের নাট্যকারদের মধ্যে বাদল সরকারের সমকালীন নাট্যকারবৃন্দের মধ্যে উৎপল দত্ত (১৯২৯-১৯৯৩), মোহিত চট্টোপাধ্যায় (১৯৩৪), মনোজ বসু (১৯৩৮) প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এদের মধ্যে বাদল সরকার অগ্রগণ্য। এ সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

“বাদল সরকার শুধুমাত্র নাট্যকার ছিলেন না। তিনি উৎপল দত্ত, মনোজ বসুর মতো নাট্যকর্মীও বটে।

তিনি একাধারে দক্ষ সংগঠক, নির্দেশক এবং অভিনেতা।”^১

বাদল সরকারের নাটকগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য বাঘ (১৯৬৬), পরের কোনদিন (১৯৬৬), প্রলাপ (১৯৬৬), বিবর (১৯৬৬), পাগলা ঘোড়া (১৯৬৬), সাকার্স (১৯৬৬), ত্রিশ শতাব্দী (১৯৬৬), মিছিল (১৯৬৬) ইত্যাদি। নাটকে বাদল সরকার ভিন্ন আঙ্গিক যোজনা করেছেন। তার নাটকের আঙ্গিক সম্পর্কে সমালোচকের উক্তি প্রণিধানযোগ্য—

“বাদল সরকার মূলত নিরীক্ষণপ্রবণ নাট্যকার। এ যুগের শিল্পভাবনায় নাটকে যে নতুন দিক নির্দেশনা দেওয়া সম্ভব, প্রতীক যেখানে অনায়াসে বিষয়ভাবনায় অভিনব কৌশল যোজনা করতে পারে, বাদল সরকারের ‘এবং ইন্দ্রজিৎ’ এই ধারার একখানি উল্লেখযোগ্য নাটক। এছাড়া তিনি গতানুগতিক শিল্পভাবনাকে পরিহার করে লিখেছেন ‘বাকি ইতিহাস’, ‘বড়ো পিসিমা’, ‘ত্রিশ শতাব্দী’, ‘মিছিল’ ইত্যাদি নাটক।”^২

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটির রচনাকাল ১৯৬৫। নাটকটি প্রথমে ‘বহুরুপী’ পত্রিকায় এবং পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এ নাটকে মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের মনস্তাত্ত্বিক বিকার যার ফলে একজন দশ বছরের কন্যার সাথে সৃষ্ট নোংরামি নাট্যকার তুলে ধরেছেন। নাট্যকার পার্বতী চরিত্র অবলম্বন করে আমাদের সমাজের যৌন লালসাময়ী মানুষের মুখোশ উন্মোচন করেছেন।

মধ্যবিত্ত জীবন ভাবনার বিভিন্ন দিক এই নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ছুটির সকালে সারা সপ্তাহের কাজের ফিরিস্তি, ইলেকট্রিক বিল জমা না দেয়া, ঘুরতে যাওয়ার চিন্তা, রাস্তার ভিড় চিন্তা করা, ছুটির দিনে মশারি কাচা ইত্যাদি আলোচনায় শুরু হয় শরদিন্দু-বাসন্তীর ছুটির দিনের সকাল। শরদিন্দু সাহিত্যের অধ্যাপক। বাসন্তী সাধাসিধে মধ্যবিত্ত ঘরের গৃহবধু আবার অবসরে গল্প লেখে। শরদিন্দুর কাছে সে গল্পের প্লট চায়লে শরদিন্দু বলে –

“প্লট! সমস্ত দুনিয়া গল্পের প্লটে ঠাসা। জীবনটাই গল্পের প্লট।”^৩

শরদিন্দু বাসন্তী যখন গল্পের প্লট খুঁজতে ব্যস্ত তখন তাদের নজরে পড়ে সংবাদপত্র। সীতানাথ চক্রবর্তী নামে জনৈক ব্যক্তি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সীতানাথ তাদের পূর্ব পরিচিত। সীতানাথ ও তার স্ত্রী কণার সঙ্গে বাসন্তী-শরদিন্দুর পরিচয় হয়েছিল বোটানিক্যাল গার্ডেনে বেড়াতে গিয়ে। শরদিন্দু ও বাসন্তী তাদের সঙ্গে ঘুরেছিল, খেয়েছিল, তারপর ভাবানীপুর পর্যন্ত একই বাসে একই সঙ্গে ফিরেছিল। সীতানাথের মৃত্যুর খবর তাদেরকে আলোড়িত করে। শরদিন্দুর ধারণা আত্মহত্যা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ঘটনা। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ আত্মহত্যা করে না। আবার সম্পূর্ণ উন্মাদ হলেও করে না। সীতানাথের আত্মহত্যাকে কেন্দ্র করে শরদিন্দু ও বাসন্তী নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে গল্প লেখা শুরু করে।

বাসন্তী তার নিজের জীবন ভাবনা দিয়ে নির্মাণ করে সীতানাথ-কণার নাটক। সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ হিসেবে সে মনে করে এর পেছনে রয়েছে কোন নারী। এখানে সে নারী নিঃসন্দেহে সীতানাথের স্ত্রী কণা। কণার সঙ্গে অন্য কোন পুরুষের সম্পর্কই বোধহয় স্বামী সীতানাথের আত্মহত্যার কারণ। সীতানাথের ধনী বন্ধু নিখিল। নিখিলের সাথে কণার একটা সম্পর্ক তৈরী হয়। তবে নিজের ঘর সংসার ত্যাগ করে সে নিখিলের সঙ্গে জীবন গড়ে তুলতে পারে না। স্বামী সীতানাথের সাথেই ঘর সংসার করতে চায়। সীতানাথকে ঘিরেই নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে চায়। একটা স্থায়ী বাড়ি তৈরীর খুব ইচ্ছা ছিল কণার। তার জন্য তিল তিল করে অর্থ সঞ্চয় করা হয়েছে। কণা বিবাহ-পূর্ব জীবনে নিজের বলে কিছু পায়নি। সে স্বামী ঘর-সংসার নিয়ে সুন্দর করে বাঁচতে চায়। যখন তার কষ্ট করে জমানো টাকা হারিয়ে যায়, তখন স্বামী সংসার সবকিছুকে তার অর্থহীন বলে মনে হতে থাকে। স্বামী সংসার ছেড়ে সে চলে যায় স্বামীর বন্ধু নিখিলের কাছে।

কণার জমানো টাকা ব্যাংক থেকে তুলে নেওয়া, কেনা জমি মটগেজ রেখে টাকা নেওয়া এসব কিছু সীতানাথ নিজের স্বার্থে করেনি। বরং কণার বাবার জুয়া খেলা, আফিম খাওয়ার টাকা জোগাতে, কণার বাবাকে বাঁচানোর জন্য সব টাকা খরচ করেছে। যা কণা জানতে পারল না। সীতানাথ কণার বাবাকে আড়াল করতে চেয়েছিল। কণা ছাড়া সীতানাথের জীবনে আর কেউ ছিল না। কণার এ মর্মান্তিক আচরণ সীতানাথ সহ্য করতে পারেনি। বাসন্তীর বর্ণনার ভাষায় –

“একগাছা দড়ি হাতে গিয়েছিল তবু একা একা।”^৪

এভাবে বাসন্তী নাটকের মধ্যে গল্প নিয়ে এসেছেন। আবার সে গল্পের মধ্যেও আছে নাটকীয়তা। সীতানাথের আত্মহত্যার অজানা বাকি ইতিহাস লিখেছে বাসন্তী। অন্যদিকে শরদিন্দু নিজের মতো করে সীতানাথের আত্মহত্যার অজানা বাকি ইতিহাস অন্বেষণ করেছে। শরদিন্দুর মতে - আত্মহত্যা যদি কেউ করে, তবে বুঝতে হবে তার মনে কোথাও কোন অস্বাভাবিকতা বাসা বেধেছিল। অনেকদিন ধরে ছিল। অর্থাৎ সে সুস্থ ছিল না।

বাসন্তীর গল্প নির্মাণে ছিল নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের কোন্দল। মধ্যবিত্তের জীবন ভাবনার একটি দিক এখানে ফুটে উঠেছে। তাইতো শরদিন্দু জানাতে পেরেছিল -

“কণা কাউকেই সত্যি সত্যি ভালোবাসেনি। নিখিলকেও না, সীতানাথকেও না। ছোটবেলায় একটানা দারিদ্র তাকে শুধু একটা জিনিসই শিখিয়েছে দারিদ্র থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছে। টাকার লোভ নয়, নিশ্চিত আশ্রয়ের লোভ।”^৫

শরদিন্দু নিজের মতো করেই সীতানাথের সমস্যাকে দেখতে চায়। দীর্ঘদিন মনের মধ্যে অস্থিরতা ও অস্বাভাবিকতা বাসা বাঁধলে তা মানুষকে অসুস্থ করে তোলে - এই বোধ থেকেই তৈরী হয় শরদিন্দুর গল্প। শরদিন্দুর গল্পে সীতানাথ মানসিক অস্থিরতার রোগী। ঘুমের ঘোরেও ইদানিং সীতানাথ অসংলগ্ন কথা বলে। সেদিন স্কুল থেকে ফিরে একটা বই পড়েছে। সে বইটি আবার পুড়িয়ে ফেলেছে। পরবর্তীতে জানতে পারি, ক্লাসরুমে লুকিয়ে ভ্লাডিমির নবোকভ এর লোলিটা উপন্যাসটি পড়ার অপরাধে সীতানাথ একটা ছাত্রকে এক্সপেল করে। এ শাস্তিকে কম শাস্তি বলে সীতানাথের মত। তার মতে, ছাত্রটিকে বাস্তবে ল্যাম্পপোস্টে বেঁধে চাবুক মারা উচিত। কিন্তু এই উপন্যাসটি সরকারিভাবে নিষিদ্ধ নয়, তবু এই বই সীতানাথের কাছে জগতের জঘন্যতম বই, বিষাক্ত বই। সীতানাথের অনুদযাটি এই অধ্যায় বিশ্লেষণ করতে শরদিন্দু তার গল্পকে নিয়ে আসে মধ্য ভারতে এক জঙ্গলময় অঞ্চল চম্বলগড়ে। সীতানাথ ঘুমের ঘোরে এই জায়গাটির নাম উচ্চারণ করত। এই অঞ্চলের সাথে জড়িত ঘটনার অনেকটা কণা জানে। তবে সবটা নয়। বিয়ের তিনবছর পরে কণা - সীতানাথ বেড়াতে গিয়েছিল চম্বলগড়ে বন্ধু ফরেষ্ট অফিসার ও তপনবাবুর ব্যবস্থাপনায়। সেখানে তারা দেড়মাস ছিল। এই দেড়মাস ফরেষ্ট কর্মীর দশ-এগারো বছরের মেয়ে পার্বতীর সঙ্গে সীতানাথ ও কণার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিশেষ করে সীতানাথের সঙ্গে। সমালোচকের ভাষায় –

“আদিম আরণ্যক জীবনের পরিবেশের মাধ্যমে সভ্যতার আদিম প্রকরণে গল্পকে সাজানো হল।”^৬

সীতানাথ মাঝে মাঝে অস্থির হয়ে উঠতো। একদিন সে রেগে গিয়ে পার্বতীকে চড় মেরেছে। সেই চড় খেয়ে পার্বতী জঙ্গলের মধ্যে ছুটে গিয়েছে। তাকে সীতানাথ খুঁজতে বের হয়েছিল। সারাদিন অপেক্ষার পর আনা হল আহত সীতানাথকে। তারপর আনা হল ভীতসন্ত্রস্ত পার্বতীকে। সেদিনের পর থেকে পার্বতী সীতানাথকে ভয় পায়। চম্বলনগর থেকে চলে আসার পর সীতানাথ পার্বতীকে ভুলতে চায়। হঠাৎ একদিন স্কুলের দশ এগারো বছরের গৌরী এসে দাঁড়ায় সীতানাথের জীবনে। সীতানাথ নিজের সঙ্গে লড়াই চালায় –

“গৌরী। হাঁ বিজয়, গৌরী। পার্বতী হয়তো অতীত। কিন্তু গৌরী বর্তমান। পার্বতী হয়তো অন্য ডাকাতের হাতে পড়েছিল, কিন্তু গৌরীর কথা কে বলতে পারে?”^৭

পার্বতীর প্রতি সীতানাথ যে ঘৃণা আচরণ করেছিল, আবার নতুন করে গৌরীর মধ্য দিয়ে সেই সম্ভাবনা প্রবলতর হওয়ায় সীতানাথ সমস্ত দায়ভার থেকে মুক্ত হতে চায় ফাঁসির দড়ি হাতে নিয়ে। তারপরে গৌরীর উদ্দেশ্যে বলে -

“গৌরী। গৌরী। তোর কোনো ভয় নেই। সে ডাকাত তোকে ছুঁতে পারবে না। তাকে আমি ফাঁসি দেবো, পার্বতীকে বাঁচাতে পারিনি, কিন্তু তোর কোনো ভয় নেই। তোর কাকাবাবু সে ডাকাতকে ফাঁসি দিয়ে দেবে।”^৮

শরদিন্দুর এ গল্পের পরপরই নাটকটি তার ক্লাইমেক্সে পৌঁছায়। এখানে আমরা দ্বিধাগ্রস্ত হই যে, শরদিন্দুর জীবনে ও কি এমন ইতিহাস ছিল। শরদিন্দু মুখোমুখি হয় নিজেরই সৃষ্ট চরিত্র সীতানাথের। শরদিন্দুর সৃষ্ট চরিত্র সীতানাথ তারই আত্মদর্শন। তৃতীয় অঙ্কে সীতানাথ ও শরদিন্দুর কথোপকথনে তারই ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অংশবিশেষ উদ্ধৃত করছি -

“সীতানাথ : সহজ কথা বোঝা শক্ত। সহজ কথা কেউ বুঝতে পারেনা। বোধ হয় কেউ বুঝতে চায় না।

শরদিন্দু : বুঝতে পারলাম না।

সীতানাথ: আমিও তাই বলছি। বুঝতে পারলে না। তোমার স্ত্রী বুঝতে পারলো না। কণা বুঝতে পারলো না। কেউ বুঝতে পারলো না। কী করে বুঝবে...”^৯

এখানে বাসন্তী বুঝতে পারলো না যে, শরদিন্দুর জীবনেও এমন ঘটনা ঘটেছে এবং কণাও বুঝতে পারলো না, ঐ ডাকাত সীতানাথই ছিল। সীতানাথও বার বার শরদিন্দু কে বলেছে—

“তুমি আত্মহত্যা করোনি কেন শরদিন্দু।”^{১০}

অবশেষে শরদিন্দু যখন আত্মহত্যার দিকে যাচ্ছিল তখনই বাসুদেব এসে তার মধ্যে নতুন আশার সঞ্চার করেন। এই আশাই শরদিন্দুকে বাঁচিয়ে রাখে, কিন্তু ভিতরে থাকে বাকি ইতিহাসের অন্তর্দহন। নাট্যকারের এই সংলাপে নাটকের মূল প্রতিপাদ্য ফুটে উঠেছে—

“শরদিন্দু দু’হাতের শক্ত মুঠোয় কপাল রেখে বসে। তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন। ‘বাকি ইতিহাসের’ চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।”^{১১}

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের চরিত্র নির্মাণে বাদল সরকার অসাধারণ নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। এ নাটকের চরিত্রগুলোর মধ্যে— শরদিন্দু, বাসন্তী, বাসুদেব, সীতানাথ, কণা, নিখিল, বিজয়, পাবতী, গৌরী অন্যতম। চরিত্রগুলোকে দুটো ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যায়। যথা— ১. প্রকৃত চরিত্র ২. কল্পিত চরিত্র। প্রকৃত চরিত্রের মধ্যে রয়েছে শরদিন্দু, বাসন্তী, বাসুদেব। অন্যদিকে, শরদিন্দু ও বাসন্তীর কল্পনায় অঙ্কিত চরিত্র সীতানাথ, কণা, নিখিল, বিজয়, পার্বতী, গৌরী ইত্যাদি।

শরদিন্দু ও বাসন্তী কাহিনির কথক বা রচনাকারী। নাট্যকারের ভাবনা এই দুই চরিত্রের মাধ্যমে ফুটে উঠেছে। নাট্যকারের প্রতিচ্ছবি শরদিন্দু। বাসন্তী চরিত্রের মাধ্যমে নারী জাতির স্বাভাবিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। চরিত্রগুলোর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উজ্জ্বল চরিত্র সীতানাথ। আপন মহিমায় উদ্ভাসিত হয়েছে সীতানাথ চরিত্রটি। সীতানাথ চরিত্রটি সমসাময়িক ঘটনার প্রেক্ষিতে নিষ্পেষিত হয়েছে দুটি কল্পিত কাহিনিতেই। বাসন্তী যেমন স্ত্রী কণার অন্যত্র চলে যাওয়ায় সীতানাথকে অসহায় দেখিয়েছেন। শরদিন্দুও অনুশোচনার মাধ্যমে সীতানাথের বিবেকের দংশন দেখিয়েছেন। সীতানাথ আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং পাপের অনুশোচনায় সিক্ত হয়েছেন। তথাপি শরদিন্দু সীতানাথের পাপ মোচনের যে প্রক্রিয়া দেখিয়েছেন তা কেবল নাট্যকারের বিবেকের বহিঃপ্রকাশ। সীতানাথ বিবেকের দংশন থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে আত্মহত্যার মাধ্যমে—

“সীতানাথের প্রবেশ। হাতে একটা মোড়ক। সীতানাথের চুল বিন্যস্ত, মুখ ক্লান্তিতে শীর্ণ। কিন্তু চোখে বিচিত্র আলো। যেন ভিতরে একটা মুক্তির আনন্দের উত্তেজনা।”^{১২}

আবার সীতানাথের আত্মহত্যার পূর্বে তার সংলাপের মাধ্যমে আমরা নিশ্চিত হই সীতানাথই ছিল সেই ডাকাত যে পার্বতীকে হরণ করেছে—

“পার্বতী, সে ডাকাতের এতোদিন ফাঁসি দেওয়া হয়নি রে! আজ দেবো! গৌরী! গৌরী! তোর কোনো ভয় নেই। সে ডাকাত তোকে ছুঁতে পারবে না। তাকে আমি ফাঁসি দেবো।”^{১৩}

জীবনের আত্মবোধে সীতানাথ চরিত্রের গ্রন্থিমোচন হয়। শরদিন্দুর গল্পের মাধ্যমে তাই সীতানাথ চরিত্রটি ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের প্রধান চরিত্র হিসেবে কাজ করে। বাসন্তীর গল্পে কণাকে যেভাবে পাই, শরদিন্দুর গল্পে সে কণাকে পাই না। বাসন্তীর গল্পে আর্থিক অভাব অনটনে বেড়ে ওঠেছে কণা। ছোটবেলা থেকেই নিজের বলতে কিছু পায়নি। বড় বোন মারা

গেল শ্বশুর বাড়ির অত্যাচারে, মা মারা গেল অসুখে আর সেজোদিদি চলে গেল বিপথে। কণার বাবা ছিল নিশ্চেষ্ট, চুরির দায়ে জেলে যায় অথচ কণা জানে তার পিতা মারা গেছে। কণার ইচ্ছা ছিল নিজের জমি হবে, বাড়ি হবে। সীতানাথও তাকে সে আশ্বাস দিয়েছিল। কিন্তু কণা যখন জানতে পারে যে এসবই মিথ্যা তখন সে সীতানাথকে ছেড়ে সীতানাথের ধনী বন্ধু নিখিলের কাছে চলে যায়। কণা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে বাসন্তীর উক্তিতে—

“কণা কাউকেই সত্যি সত্যি ভালোবাসেনি, নিখিলকেও না, সীতানাথকেও না। ছোটবেলার একটানা দারিদ্র্য তাকে শুধু একটা জিনিসই শিখিয়েছে দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার ইচ্ছে। টাকার লোভ নয়, নিশ্চিত আশ্রয়ের লোভ।”^{১৪}

অন্যদিকে, শরদিন্দুর গল্পে কণাকে শিক্ষিত, মধ্যবিত্ত পরিবারের স্ত্রী হিসেবে পাই। শরদিন্দুর গল্প অপেক্ষা বাসন্তীর গল্পে কণা চরিত্রটি উজ্জ্বল হয়েছে। নাট্যকার পার্বতী চরিত্রটি অঙ্কনের মাধ্যমে আমাদের সমাজের যৌন লালসাময়ী মানুষের মুখোশ উন্মোচন করেছেন। দশ-এগারো বছরের ফুটফুটে মেয়ে পার্বতী কীভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের মুখোশধারী ভদ্রলোক সীতানাথের হিংস্রতার শিকার হয় তা ফুটে উঠেছে। পার্বতীর প্রতিচ্ছবি গৌরী। পার্বতীর মতো গৌরী যেন হিংস্রতার শিকার না হয় সেজন্য সীতানাথ চরিত্রের বিবেকের দংশন এবং আত্মহননের মাধ্যমে মুক্তি দেখিয়েছেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর ইউরোপে অ্যাবসার্ড নাটকের সূত্রপাত। মানুষের জীবনের বিচ্ছিন্নতা, নিঃসঙ্গতা, অর্থহীনতা ও শূন্যতার অ্যাবসার্ড দর্শন পূর্ণতার রূপ পেল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী অস্তিবাদী দার্শনিক লেখক জাঁ পল সার্ত্র ও আলবেয়ার ক্যামুর রচনায়। মানুষকে দেখানো হল এক বিপন্ন জীব হিসেবে, যার সামনে কোনো উদ্দেশ্য নেই, যার দিনযাপনের কোনো অর্থ নেই। এই অর্থহীনতার পরিচয় পাই ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের সংলাপে। এছাড়া তীক্ষ্ণ ও সাবলীল সংলাপ, প্রয়োজনবোধে ইংরেজি শব্দের ব্যবহার, চলিত রীতির প্রয়োগ, হাস্যরস সৃষ্টি, প্রবাদ প্রবচন ও অলঙ্কার প্রয়োগের মাধ্যমে নাটকটি শিল্পসফলতা লাভ করেছে। তীক্ষ্ণ ও সাবলীল সংলাপ—

“বাসন্তী : কী?

শরদিন্দু : আজ রোববার।

বাসন্তী : (হেসে) সে তো দেখতেই পাচ্ছি।

শরদিন্দু : কী করবে আজ বলো।

বাসন্তী : তুমি বল।

শরদিন্দু : বেড়াতে যাবে ট্রেনে করে?

বাসন্তী : কোথায় যাবে বলো?

শরদিন্দু : যেখানে বলবে।”^{১৫}

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে বাদল সরকার চলিত ভাষার প্রয়োগ করেছেন যা প্রাজ্ঞ ও মাধুর্যময়। এর পদবিন্যাস সুনিয়ন্ত্রিত। নাটকের ভাষা—

“সীতানাথ : কণা, তোমার কাছে কি জমি-বাড়িটিই সবচেয়ে বড়ো? আমি কিছু নই?

কণা : (একটু থেমে) তুমি? তুমিই সব ছিলে-জমি-বাড়ি সব। তুমিই সব দিয়েছিলে। আবার তুমিই সব নষ্ট করে দিয়েছো।”^{১৬}

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে মধ্যবিত্তের হতাশা, ব্যর্থতা ও আক্ষেপের পরিচয় পাওয়া যায়—

“মানুষ হতে হবে। মানুষ। তখন মানুষ হওয়া বলতে বুঝাতাম - লেখাপড়া করে পরীক্ষা পাস করা। করে নিজের পায়ে দাঁড়ানো। তার অন্য নাম চাকরি করা। তার অন্য নাম - নিজের অনেকখানি অংশ নিয়মিত বিক্রি করে নিয়মিত গ্রাসাচ্ছাদনের ব্যবস্থা করা।”^{১৭}

এছাড়া নাট্যকার প্রচুর ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করেছেন। যেমন : টেম্পারেচার (Temperature), কলেজ (College), ফিলজফি (Philosophy), লজিক (Logic), প্রেজেন্ট (Present), নিউমার্কেট (New Market), এ্যাসিসট্যান্ট প্রফেসর (Assistant Professor), এক্সপ্লানেট (Explanet), ইলেকট্রিক বিল (Electric Bill), গুডমর্নিং (Good morning),

এডিটরিয়াল (Editorial), লাস্ট ডেট (Last date), কেমিস্ট্রি হেড (Chemistry Head), অফিস সেকশন (Office Section), পার্সোনাল (Personal), ফাস্ট ইমপ্রেশন (First Impression), কার্ড (Card), ইন্টারেস্টিং (Interesting) ইত্যাদি। নাটকে প্রয়োগ—

(১) “শরদিন্দু : তা তুমি বাড়িতে গিম্নিকে ফিলজফি পড়ালে পার?

বাসুদেব : ফিলজফি? লজিক? গিম্নিকে!

আপনার হলো কি শরদিন্দু!”^{১৮}

(২) “সীতানাথ : তাই সে অভিমান করে জঙ্গলে গিয়ে একটা খুনে ডাকাতির হাতে পড়ে—

বিজয় : সেটা কি তোর দোষ?

সীতানাথ : অ্যাঁ?

বিজয় : তুই রাগ করে একটা চড় মেরেছিলি বলেই সমস্ত দুর্ঘটনার দায়িত্ব নিজের উপর তুলে

নিলি? Fool! You're a fool.”^{১৯}

(৩) “শরদিন্দু : আত্মহত্যা অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ঘটনা। সম্পূর্ণ সুস্থ মস্তিষ্কে কেউ আত্মহত্যা করে না।

আবার উন্মাদ হলেও করেনা।”^{২০}

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি বাদল সরকার তিনটি অঙ্কে বিভাজন করেছেন। প্রথম অঙ্কে শরদিন্দু, বাসুদেব, বাসন্তী, সীতানাথ, কণা, নিখিল, আশুপ্তক ও বৃদ্ধের সংলাপ। দ্বিতীয় অঙ্কে বাসন্তী, শরদিন্দু, সীতানাথ, বাসুদেবের সংলাপ পরিবেশিত হয়েছে। এই তিনটি অঙ্কের মধ্য দিয়ে নাট্যকার ঘটনার ঐক্য, স্থানের ঐক্য ও সময়ের ঐক্য সম্পন্ন করেছেন। বাদল সরকার এ নাটককে মঞ্চায়নের উপযোগী করে তৈরি করেছেন। শরদিন্দু কণার সংলাপের মাধ্যমে নাট্যকার মঞ্চসজ্জার দিকটি তুলে ধরেছেন। সংলাপের ফাঁকে ফাঁকে নাটকটিতে নাট্যনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে—

(১) “আলো কমে এলো ক্রমে। অন্ধকারের আড়ালে শরদিন্দু মঞ্চ ছেড়ে চলে গেল। শূন্য মঞ্চ আলোকিত হয় আবার। কড়া নাড়ানো শব্দ। কণা রান্নাঘর থেকে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে দরজা তুলে দিলো। বিজয়ের প্রবেশ।”^{২১}

(২) “বাসন্তী বিল নিয়ে চলে গেল। শরদিন্দু উঠে একটা কাঁচি নিয়ে এলো। খবরের কাগজের একটি অংশ কাটতে লাগলো সযত্নে। বাসন্তীর প্রবেশ। এবার হাতে একটি খাম।”^{২২}

এ নাটকে শূন্যতাবোধ, অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা এবং অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের মাধ্যমে অ্যাবসার্ড ধারার বিশিষ্ট লক্ষণ প্রকাশিত হয়েছে। এ সম্পর্কে সমালোচক কুন্তল চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

“...বাকি ইতিহাস নাটকে তেমনই অসম্পূর্ণ ও কৃত্রিম দাম্পত্য সম্পর্ক নাট্যকারের বিষয়। শূন্যতাবোধ, অবসাদ, আত্মহত্যার প্রবণতা ইত্যাদি লক্ষণ ছাড়াও অস্বাভাবিক মনস্তত্ত্বের জটিলতায় এ নাটক অ্যাবসার্ড ধারার একটি বিশিষ্ট নমুনা।”^{২৩}

নাট্যকার অতীতচারিতার মাধ্যমে ঘটনাকে গতিশীলতা দিয়েছেন এবং স্থূল লক্ষ্যের দিকে নিয়ে গেছেন। প্রথম অঙ্কে কণাকে অতীত স্মৃতিচারণ করতে দেখি—

“নিজের বলতে একটা জিনিস কখনো পাইনি। ঘরতো দূরের কাথা, শাড়ি, জামা কিছু না, নিজের বলতে একটা চিরুণী পর্যন্ত ছিল না। তিন বোনে সবকিছু ভাগ। সব কিছু! কটাই বা জিনিস ছিল?”^{২৪}

বাদল সরকারের নাটকে বিগত ও তৎকালীন বিভিন্ন ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সমালোচকের মতে, -

“যেন-বা বাঁধা ধুয়ার মতোই বিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বাঁধা বাদল সরকারের নাট্যাবলিতে কেবলই ছায়া সম্পাত করে বিগত পারমানবিক ঝঞ্ঝা ও আশু প্রলয়ের ত্রাসোদ্বেল দুঃস্বপ্ন।”^{২৫}

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের ঐতিহাসিক ঘটনা, স্থান, যুদ্ধ, স্মৃতি নিদর্শন ইত্যাদির প্রসঙ্গ এসেছে। যেমন: মহাভারতের প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, হিরোশিমায় বোমায় লক্ষ লক্ষ প্রাণ হারানোর ইতিহাস, দাঙ্গার ইতিহাস, মহাযুদ্ধের

কথা, চেঙ্গিস খাঁ, নেপোলিয়ন, হিটলারের ইতিহাস, জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড, মিশরের পিরামিড, রোমান সম্রাটের নৌবিহার ইত্যাদি। নাটকে প্রয়োগ—

“সতীনাথ : আমি কাটিং রাখি। খবরের নয়। ছবির... হিটলারের কন্সনট্রেশন ক্যাম্প। ঐ লোকগুলো ইহুদী। পেছনে ডানদিকে ঐ সাদা বাড়িটা গ্রাস চেম্বার। মাদ্রিদের একটি রাস্তা স্পেনের গৃহযুদ্ধের সময়কার ঐ পড়ে থাকা বাচ্চা ছেলেটার ডান হাতটা নেই, দেখছো? হাতটা ছিড়ে বোমা খাওয়া জঞ্জালে হারিয়ে গেছে। ওটা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ছবি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অনেকগুলো ছবি পাবে— নানা দেশের। হ্যাঁ, হিরোশিমা। ঠিক ধরেছো হিরোশিমা।”^{২৬}

‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে বাদল সরকার ভিন্ন আঙ্গিক যোজনার পাশাপাশি শব্দালঙ্কার ও অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ করেছেন।

উপমা :

- (১) দড়িটা সাপের মতো লিক লিক করে উঠলো। - ২য় অঙ্ক।
- (২) একটা নালার মতো সরু নদী ঝরঝরে পরিষ্কার জল। - ২য় অঙ্ক।

উৎপ্রেক্ষা :

- (১) শালবনের পাতাগুলো যেন আগুনের হুকা হয়ে জ্বলছে। গরম বাতাস যেন স্বচ্ছ ধোঁয়া হয়ে থরথর করে কাঁপছে। - ২য় অঙ্ক।

দ্বিরুক্ত শব্দের ব্যবহার :

- (১) তেরো বছর ধরে রাশি রাশি ছাত্র। সারি সারি বেঞ্চিতে রাশি রাশি ছাত্র।। - ১ম অঙ্ক
- (২) যেতে যেতে দম ফুরিয়ে যায়। - ১ম অঙ্ক।
- (৩) ও জল ফুটতে ফুটতে এসে পড়বে। - ১ম অঙ্ক।
- (৪) বাসন্তী : কী করে যে তুমি শুয়ে শুয়ে লেখো বুঝি না বাবা।
- শরদিন্দু : কী করে যে তুমি বসে বসে লেখো বুঝি না বাবা। - ১ম অঙ্ক।

হাস্যরস : নাটকটিতে হাস্যরসের ব্যবহারও পরিলক্ষিত। যেমন : “বাসুদেব : কতোবার বলেছি প্রতি রবিবার এক বালতি চা সন্ধ্যাবেলাই করে রাখবেন, তা কিছতেই শুনবেন না?” - ১ম অঙ্ক।

সুভাষিত উক্তি :

- (১) প্লট। সমস্ত দুনিয়া গল্পের প্লটে ঠাসা। জীবনটাই তো গল্পের প্লট। - ১ম অঙ্ক।
- (২) মৃত্যুকে বাদ দিয়ে কি জীবন হয়? - ৩য় অঙ্ক।
- (৩) আলাদা আলাদা মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা ইতিহাস হয়তো আছে। এ তা নয়। এ বাকি ইতিহাস। - ৩য় অঙ্ক।

প্রবাদ প্রবচন :

বিধুভূষণ : যে বই খোলা বাজারে বিক্রি হচ্ছে, তা পড়বার জন্যে স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়াটা লঘুপাপে গুরুদণ্ড হবে সীতানাথ। - ২য় অঙ্ক।

এ নাটকে বাদল সরকার বোঝাতে চেয়েছেন, অতীত কখনো মুছে ফেলা যায় না। অতীতের পুনরাবৃত্তি ঘটবেই বা ঘটে কোনো না কোনো ঘটনার মাধ্যমে। অতীতকে বহন করেই আমাদের বাকি জীবনটা বেঁচে থাকতে হবে। নাট্যকার বলতে চেয়েছেন পৃথিবীতে যুদ্ধ, দাঙ্গা, মহামারী, হত্যা, ধর্ষণ আছে - থাকবে ভবিষ্যতেও, তবু মানুষকে বাঁচতে হবে। আশাই মানুষকে বাঁচিয়ে রাখে বাকি জীবনটা ধরে। আশায় বুক বেঁধে মানুষ সামনে বা ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যায়। বর্তমানে দুঃখ কষ্ট থাকলে মানুষ ভাবে ভবিষ্যতে বুঝি সুখ পাবে। এই আশায় বুক বেঁধেই মানুষ জীবনের বাকি সময়টা কাটাতে চায়। সীতানাথ ও শরদিন্দুর কথোপকথনে তা ফুটে উঠেছে।

“সীতানাথ : মানুষ হয় বাঁচবে, না হয় মরবে।

শরদিন্দু : কিন্তু অন্য সবাই?

সীতানাথ : অন্য সবাই পারে শরদিন্দু। না বেঁচে না মরে পারে।

শরদিন্দু : কী করে পারে তারা?

সীতানাথ : আশায়।

শরদিন্দু : আশা?

সীতানাথ : জীবনের অর্থ ফুরোলে ভাবে একদিন অর্থ ফিরবে। বেঁচে থাকা শেষ হলে ভাবে একদিন আবার শুরু হবে। তাদের আশা আছে।”^{২৭}

জীবন মানে আশা। আশা আছে বলেই মানুষ পৃথিবীতে বেঁচে থাকে। আশায় বুক বেঁধে মানুষ ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ায় নতুন সূর্যোদয়ের আকাঙ্ক্ষায়। শরদিন্দুও আত্মহননের দিকে যাচ্ছিল। কিন্তু হঠাৎ আশাই তাকে নতুন জীবন দান করে। হরেকৃষ্ণের চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ায় শরদিন্দু তার বহুদিনের স্বপ্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর হওয়ার সুযোগ পায়। শরদিন্দু যখন আত্মহত্যা করার জন্য ল্যাম্পের লম্বা তার নেয় সেই মুহূর্তেই বাসুদেবের আগমনে তার মনে নতুন আশা সঞ্চারিত হয়—

“শরদিন্দু : অ্যাঁ? (গা ঝাড়া দিয়ে) না না। বাসুদেব, তুমি তো আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছো! বিরাট খবর এনেছো তুমি! দারুণ খবর!”^{২৮}

মানুষের জীবনের আলাদা আলাদা ইতিহাস হয়তো থাকে। যা সীতানাথের ছিল, শরদিন্দুর ছিল। ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকের শেষে নাট্যকার শরদিন্দু সম্পর্কে বলেছেন -

“তার শরীর যন্ত্রণায় কঠিন। বাকি ইতিহাসের চেতনা বহন করে বাকি জীবনটা বেঁচে থাকবার যন্ত্রণা।”^{২৯}

এ ইতিহাস ভেতরের ইতিহাস। যা নিয়ত মানুষকে কুঁড়ে কুঁড়ে খায়। এ বাকি ইতিহাসের অন্তর্দহন নিয়েই মানুষ বাকি জীবনটা বেঁচে থাকে।

বাদল সরকার তাঁর ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকে বিষয় নির্বাচন ও আঙ্গিক বিচারে অনন্য কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। নতুন ড্রিটমেন্ট, চরিত্র সমূহের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ ও দ্বন্দ্ব এবং সংলাপ তৈরির অপূর্ব কৌশলে ‘বাকি ইতিহাস’ নাটকটি মঞ্চসফল হয়েছে। এই নাটকে তিনি গতানুগতিক পারিবারিক ড্রামার খোলস ভেঙে মধ্যবিত্তের অন্তরাত্মাকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। এই নাটকটি কেবল একটি আত্মহত্যার রহস্য উন্মোচন নয়, বরং এটি সমকালীন ও সর্বকালীন মধ্যবিত্ত মানসিকতার এক শৈল্পিক পোস্টমর্টেম।

Reference:

১. সরকার, বাদল, *বাকি ইতিহাস*, ভূমিকাংশ-পবিত্র সরকার, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, প্রকাশকাল: ১৪১৬, পৃ. ২
২. ইসলাম, আজহার, *বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস: আধুনিক যুগ*, অনন্যা প্রকাশনী, আগস্ট ২০০৯, পৃ. ৪৯২
৩. সরকার, বাদল, *নাটক সমগ্র*, ভূমিকা: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ৪৫
৪. তদেব, পৃ. ৬২
৫. তদেব, পৃ. ৬৩
৬. চৌধুরী, দর্শন, *নাট্যব্যক্তি বাদল সরকার*, একুশ শতক (কলকাতা), প্রথম প্রকাশ: ২০০৯, পৃ. ৬১
৭. সরকার, বাদল, *নাটক সমগ্র*, ভূমিকা: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ৮১
৮. তদেব, পৃ. ৮৩
৯. তদেব, পৃ. ৮৬

১০. তদেব, পৃ. ৮৬

১১. তদেব, পৃ. ৯৭

১২. তদেব, পৃ. ৯৮

১৩. তদেব, পৃ. ৯২

১৪. তদেব, পৃ. ৬৩

১৫. তদেব, পৃ. ৪৪

১৬. তদেব, পৃ. ৫৬

১৭. তদেব, পৃ. ৫৬

১৮. তদেব, পৃ. ৫২

১৯. তদেব, পৃ. ৭২

২০. তদেব, পৃ. ৪৪

২১. তদেব, পৃ. ৯০

২২. তদেব, পৃ. ৪৫

২৩. চট্টোপাধ্যায়, কুন্তল, *সাহিত্যের রূপরীতি ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, রত্নাবলী পাবলিশার্স, প্রকাশকাল: ২০২৪, পৃ. ১৬৫

২৪. সরকার, বাদল, *নাটক সমগ্র*, ভূমিকা: শিবাজী বন্দ্যোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৪১৬, পৃ. ৪৭

২৫. তদেব, পৃ. ১৫

২৬. তদেব, পৃ. ৯৮

২৭. তদেব, পৃ. ৭৫

২৮. তদেব, পৃ. ৯৬

২৯. তদেব, পৃ. ৯৭